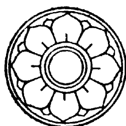
জগন্নাথের রথ

শ্রীঅরবিন্দ



১৩৩৯
রামেশ্বর এণ্ড কোং
চন্দননগর

প্রকাশক
শ্রীরামেশ্বর দে
চন্দননগর

প্রথম সংস্করণ • আশ্বিন '২৮
দ্বিতীয় সংস্করণ • মাঘ '৩৯

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

বিষয়

জগন্নাথের রথ

আদর্শ সমাজ মনুষ্য-সমষ্টির অন্তরাত্মা ভগবানের বাহন, জগন্নাথের যাত্রার রথ। ঐক্য স্বাধীনতা জ্ঞান শক্তি সেই রথের চারি চক্র।

মনুষ্যবুদ্ধির গঠিত কিম্বা প্রকৃতির অশুদ্ধ প্রাণস্পন্দনের খেলায় সৃষ্ট যে সমাজ, তাহা অন্য প্রকার। এটি সমষ্টির নিয়ন্তা ভগবানের রথ নহে, মুক্ত অন্তর্যামীকে আচ্ছাদিত করিয়া যে বহুরূপী দেবতা ভগবৎ-প্রেরণাকে বিকৃত

করে, ইহা সমষ্টিগত সেই অহঙ্কারের বাহন। এটি চলিতেছে নানা ভোগপূর্ণ লক্ষ্যহীন কর্ম্মপথে, বুদ্ধির অসিদ্ধ অপূর্ণ সঙ্কল্পের টানে, নিম্নপ্রকৃতির পুরাতন বা নূতন অবশ প্রেরণায়। যতদিন অহঙ্কারই কর্ত্তা, ততদিন প্রকৃত লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব,—লক্ষ্য জানা গেলেও সেদিকে সোজা রথ চালান অসাধ্য। অহঙ্কার যে ভাগবত পূর্ণতার প্রধান বাধা, এই তথ্য যেমন ব্যষ্টির, তেমনই সমষ্টির পক্ষেও সত্য।

সাধারণ মনুষ্যসমাজের তিনটি মুখ্য ভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি নিপুণ কারিগরের সৃষ্টি, সুঠাম চাকচিক্যময় উজ্জ্বল অমল সুখকর, তাহাকে বহিয়া লইয়াছে বলবান্ সুশিক্ষিত অশ্ব, সে অগ্রসর হইতেছে সুপথে সযত্নে ত্বরারহিত অমন্থর গতিতে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার ইহার মালিক আরোহী। যে উপরিস্থ উত্তুঙ্গ প্রদেশে ভগবানের মন্দির, রথ তাহারই চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু কিছু দূরে দূরে রহিয়া,

সেই উচ্চভূমির খুব নিকটে সে পৌঁছিতে পারে না। যদি উঠিতে হয়, তবে রথ হইতে নামিয়া একা পদব্রজে উঠাই নিয়ম। বৈদিকযুগের পরে প্রাচীন আর্য্যদের সমাজকে এই ধরণের রথ বলা যায়।

দ্বিতীয়টি বিলাসী কর্ম্মঠের মোটরগাড়ী। ধূলার ঝড়ের মধ্যে ভীমবেগে ব্রজনির্ঘোষে রাজপথ চূর্ণ করিয়া অশান্ত অশ্রান্ত গতিতে সে ধাইয়াছে, ভেরীর রবে শ্রবণ বধির, যাহাকে সম্মুখে পায় দলিয়া পিষিয়া চলিয়া যায়। যাত্রীর প্রাণের সঙ্কট, দুর্ঘটনা অবিরল, রথ ভাঙ্গিয়া যায়, আবার কষ্টেস্থষ্টে মেরামতের পর সদর্প চলন। নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, তবে যে নূতন দৃশ্য অনতিদূরে চোখের সম্মুখে পড়ে, "এই লক্ষ্য, এই লক্ষ্য" চীৎকার করিয়া রথের মালিক রাজসিক অহঙ্কার সেই দিকে ছুটে। এই রথে চলায় যথেষ্ট ভোগ সুখ আছে, বিপদও অনিবার্য্য, ভগবানের নিকট পৌঁছা অসম্ভব।

আধুনিক পাশ্চাত্যসমাজ এই ধরণেরই মোটর-গাড়ী।

তৃতীয়টি মলিন পুরাণ কচ্ছপগতি আধভাঙ্গা গরুরগাড়ী, টানে কৃশ অনশনক্লিষ্ট আধমরা বলদ, চলিতেছে সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথে ; একজন ময়লাকাপড়পরা ভুঁড়িসর্ব্বস্ব শ্লথ অন্ধ বৃদ্ধ ভিতরে বসিয়া মহাসুখে কাদামাখা হুঁকা টানিতে টানিতে গাড়ীর কর্কশ ঘ্যান্ ঘ্যান্ শব্দ শুনিতে শুনিতে অতীতের কত বিকৃত আধ আধ স্মৃতিতে মগ্ন। এই মালিকের নাম তামসিক অহঙ্কার। গাড়োয়ানের নাম পুঁথি-পড়া জ্ঞান, সে পঞ্জিকা দেখিতে দেখিতে গমনের সময় ও দিক নির্দ্দেশ করে, মুখে এই বুলি "যাহা আছে বা ছিল, তাহাই ভাল, যাহা হইবার চেষ্টা তাহাই খারাপ।" এই রথে ভগবানের নিকট না হৌক শূন্য ব্রহ্মে পৌঁছিবার বেশ আশু সম্ভাবনা আছে।

তামসিক অহঙ্কারের গরুর গাড়ী যতক্ষণ

গ্রামের কাঁচাপথে চলে, ততক্ষণ রক্ষা। যেদিন জগতের রাজপথে সে উঠিয়া আসিবে যেখানে ভূরি ভূরি বেগদৃপ্ত মোটরের ছুটাছুটি, তখন তাহার কি পরিণাম হইবে, সে কথা ভাবিতেই প্রাণ শিহরিয়া উঠে। বিপদ এই যে রথ বদলানের সময় চেনা বা স্বীকার করা তামসিক অহঙ্কারের জ্ঞান শক্তিতে কুলায় না। চিনিবার প্রবৃত্তিও নাই, তাহা হইলে তাহার ব্যবসা ও মালিকত্ব মাটি। সমস্যা যখন উপস্থিত, যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ বলে "না থাক্, ইহাই ভাল, কেননা ইহা আমাদেরই"—তাঁহারা গোঁড়া অথবা ভাবুক দেশভক্ত। কেহ কেহ বলে, "এদিক ওদিক মেরামত করিয়া লও না"—এই সহজ উপায়ে নাকি গরুরগাড়ী অমনি অনিন্দ্য অমূল্য মোটরে পরিণত হইবে ;—ইঁহাদের নাম সংস্কারক। কেহ কেহ বলে, "পুরাতন কালের সুন্দর রথটি ফিরিয়া আসুক"—তাঁহারা সেই অসাধ্য সাধনের উপায়ও খুঁজিতে মাঝে মাঝে

প্রয়াসী। আশার অনুরূপ ফল যে হইবে, তাহার বিশেষ কোন লক্ষণ কোথাও কিন্তু নাই।

তিনটির মধ্যেই যদি পছন্দ করা অনিবার্য্য হয়, আরও উচ্চতর চেষ্টা যদি আমরা পরিহার করি, তবে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের নূতন রথ নির্ম্মাণ করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু জগন্নাথের রথ যতদিন সৃষ্ট না হয়, আদর্শ সমাজও ততদিন গঠিত হইবে না। সেইটিই আদর্শ, সেইটিই চরম, গভীরতম উচ্চতম সত্যের বিকাশ ও প্রতিকৃতি। মনুষ্যজাতি গুপ্ত বিশ্বপুরুষের প্রেরণায় তাহাকেই গড়িতে সচেষ্ট, কিন্তু প্রকৃতির অজ্ঞানবশে গড়িয়া বসে অন্যরূপ প্রতিমা—হয় বিকৃত অসিদ্ধ কুৎসিত, নয় চলনসই অর্দ্ধসুন্দর বা সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ; শিবের বদলে হয় বামন, নয় রাক্ষস, নয় মধ্যম লোকের অর্দ্ধদেবতা।

জগন্নাথের রথের প্রকৃত আকৃতি বা নমুনা কেহ জানে না, কোন জীবন-শিল্পী আঁকিতে

পারগ নন। সেই ছবি বিশ্বপুরুষের হৃদয়ে প্রস্তুত, নানা আবরণে আবৃত। দ্রষ্টা কর্ত্তা অনেক ভগবদ্‌বিভূতির অনেক চেষ্টায় আস্তে আস্তে বাহির করিয়া স্থূল জগতে প্রতিষ্ঠা করা অন্তর্য্যামীর অভিসন্ধি।

* *
*

জগন্নাথের এই রথের আসল নাম সমাজ নয়, সংঘ। বহুমুখী শিথিল জনসংঘ বা জনতা নয়; আত্মজ্ঞানের, ভাগবতজ্ঞানের ঐক্যমুখী শক্তির বলে সানন্দে গঠিত বন্ধনরহিত অচ্ছেদ্য সংহতি, ভাগবত সংঘ।

অনেক সমবেত মনুষ্যের একত্র কর্ম্ম করিবার উপায় যে সংহতি, তাহাই সমাজ নামে খ্যাত। শব্দের উৎপত্তি বুঝিয়া অর্থও বোঝা যায়। সম্ প্রত্যয়ের অর্থ একত্র, অজ্ ধাতুর

অর্থ গমন ধাবন যুদ্ধ। সহস্র সহস্র মানব কর্ম্মার্থে ও কামার্থে সমবেত, এক ক্ষেত্রে নানা লক্ষ্যের দিকে ধাবিত, কে আগে যায় কে বড় হয়, তাহা লইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি—competition—যেমন অন্য সমাজের সঙ্গে তেমন পরস্পরের সঙ্গেও যুদ্ধ ও ঝগড়াঝাটি—এই কোলাহলের মধ্যেই শৃঙ্খলার জন্য, সাহায্যের জন্য, মনোবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য নানা সম্বন্ধ স্থাপন, নানা আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ফলে কষ্টসিদ্ধ অসম্পূর্ণ অস্থায়ী কিছু, ইহাই সমাজের, প্রাকৃত সংসারের চেহারা।

ভেদকে ভিত্তি করিয়া প্রাকৃত সমাজ। সেই ভেদের উপর আংশিক অনিশ্চিত ও অস্থায়ী ঐক্য নির্ম্মিত। আদর্শ সমাজের গড়ন ঠিক ইহার বিপরীত। ঐক্য ভিত্তি; আনন্দবৈচিত্র্যের জন্য—ভেদের নয়—পার্থক্যের খেলা। সমাজে পাই শারীরিক, মানসকল্পিত ও কর্ম্মগত ঐক্যের আভা আত্মগত ঐক্য সংঘের প্রাণ।

আংশিকভাবে সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে সংঘস্থাপনের নিষ্ফল চেষ্টা কতবার হইয়াছে, হয় তাহা বুদ্ধিগত চিন্তার প্রেরণায়—যেমন পাশ্চাত্যদেশে, নয় নির্ব্বাণোন্মুখ কর্ম্মবিরতির স্বচ্ছন্দ অনুশীলনার্থে—যেমন বৌদ্ধদের, নয় বা ভাগবত ভাবের আবেগে—যেমন প্রথম খৃষ্টীয় সংঘ। কিন্তু অল্পের মধ্যেই সমাজের যত দোষ অসম্পূর্ণতা প্রবৃত্তি ঢুকিয়া সংঘকে সমাজে পরিণত করে। চঞ্চল বুদ্ধির চিন্তা টেঁকে না, পুরাতন বা নূতন প্রাণ প্রবৃত্তির অদম্য স্রোতে ভাসিয়া যায়। ভাবের আবেগে এই চেষ্টার সাফল্য অসম্ভব, ভাব নিজের খরতায় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। নির্ব্বাণকে একাকী খোঁজা ভাল, নির্ব্বাণপ্রিয়তায় সংঘসৃষ্টি একটা বিপরীত কাণ্ড। সংঘ স্বভাবতঃ কর্ম্মের, সম্বন্ধের লীলাভূমি।

যেদিন জ্ঞান কর্ম্ম ও ভাবের সামঞ্জস্যে ও একীকরণে আত্মগত ঐক্য দেখা দিবে, সমষ্টিগত বিরাটপুরুষের ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায়,

সেদিন জগন্নাথের রথ জগতের রাস্তায় বাহির হইয়া দশ দিক আলোকিত করিবে। সত্য-যুগ নামিবে পৃথিবীর বক্ষে, মর্ত্ত্য মানুষের পৃথিবী হইবে দেবতার খেলার শিবির, ভগবানের মন্দির-নগরী, temple city of God —আনন্দপুরী।

আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয়

'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা'-শীর্ষক প্রবন্ধে আমি কয়েকজন নিরপরাধী কয়েদীর মানসিক ভাব বর্ণনা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, আর্য্যশিক্ষার গুণে কারাবাসেও ভারতবাসীর আন্তরিক-স্বাধীনতারূপ মহামূল্য পৈতৃকসম্পত্তি বিনষ্ট হয় না—উপরন্তু ঘোর অপরাধীর মধ্যেও সেই সহস্রবর্ষসঞ্চিত আর্য্য-চরিত্রগত দেবভাবও ভগ্নাবশিষ্টরূপে বর্ত্তমান থাকে। আর্য্যশিক্ষার মূলমন্ত্র সাত্ত্বিকভাব। যে সাত্ত্বিক, সে বিশুদ্ধ, সাধারণতঃ মনুষ্যমাত্রেই অশুদ্ধ। রজোগুণের প্রাবল্যে, তমোগুণের ঘোর নিবিড়তায় এই অশুদ্ধি পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত

হয়। মনের মালিন্য দুই প্রকার,—জড়তা, বা অপ্রবৃত্তিজনিত মালিন্য; ইহা তমোগুণ-প্রসূত। দ্বিতীয়,—উত্তেজনা, বা কুপ্রবৃত্তিজনিত মালিন্য; ইহা রজোগুণপ্রসূত। তমোগুণের লক্ষণ অজ্ঞানমোহ, বুদ্ধির স্থূলতা, চিন্তার অসংলগ্নতা, আলস্য, অতিনিদ্রা, কর্ম্মে আলস্যজনিত বিরক্তি, নিরাশা, বিষাদ, ভয়, এক কথায় যাহা নিশ্চেষ্টতার পরিপোষক তাহাই। জড়তা ও অপ্রবৃত্তি অজ্ঞানের ফল, উত্তেজনা ও কুপ্রবৃত্তি ভ্রান্তজ্ঞানসম্ভূত। কিন্তু তমোমালিন্য অপনোদন করিতে হইলে রজোগুণের উদ্রেক দ্বারাই তাহা দূর করিতে হয়। রজোগুণই প্রবৃত্তির কারণ এবং প্রবৃত্তিই নিবৃত্তির প্রথম সোপান। যে জড়, সে নিবৃত্ত নয়,—জড়ভাব জ্ঞানশূন্য; আর জ্ঞানই নিবৃত্তির মার্গ। কামনাশূন্য হইয়া যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে নিবৃত্ত; কর্ম্মত্যাগ নিবৃত্তি নয়। সেই জন্য ভারতের ঘোর তামসিক অবস্থা দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "রজোগুণ চাই,

দেশে কর্ম্মবীর চাই, প্রবৃত্তির প্রচণ্ড স্রোত বহুক। তাহাতে যদি পাপও আসিয়া পড়ে, তাহাও এই তামসিক নিশ্চেষ্টতা অপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল।”

সত্যই আমরা ঘোর তমোমধ্যে নিমগ্ন হইয়া সত্ত্বগুণের দোহাই দিয়া মহাসাত্ত্বিক সাজিয়া বড়াই করিতেছি। অনেকের এই মত দেখিতে পাই যে, আমরা সাত্ত্বিক বলিয়াই রাজসিক জাতিসকল দ্বারা পরাজিত, সাত্ত্বিক বলিয়া এইরূপ অবনত ও অধঃপতিত। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইয়া খৃষ্টধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট। খৃষ্টানজাতি প্রত্যক্ষফলবাদী, তাঁহারা ধর্ম্মের ঐহিক ফল দেখাইয়া ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন ; তাঁহারা বলেন—খৃষ্টান জাতিই জগতে প্রবল, অতএব খৃষ্টান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আর আমাদের মধ্যে অনেকে বলেন—ইহা ভ্রম ; ঐহিক ফল দেখিয়া ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করা যায় না, পারলৌকিক ফল দেখিতে হয়, হিন্দুরা

অধিক ধার্ম্মিক বলিয়া, অসুর প্রকৃতি বলবান পাশ্চাত্যজাতির অধীন হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তির মধ্যে আর্য্যজ্ঞানবিরোধী ঘোর ভ্রম নিহিত। সত্ত্বগুণ কখনই অবনতির কারণ হইতে পারে না; এমনকি সত্ত্বপ্রধান জাতি দাসত্ব-শৃঙ্খলিত হইয়া থাকিতে পারে না। ব্রহ্মতেজই সত্ত্বগুণের মুখ্যফল, ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজের ভিত্তি। আঘাত পাইলে শান্ত ব্রহ্মতেজ হইতে ক্ষত্রতেজের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, চারিদিক জ্বলিয়া উঠে। যেখানে ক্ষত্রতেজ নাই, সেখানে ব্রহ্মতেজ টিঁকিতে পারে না। দেশে যদি একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ থাকে সে এক শ' ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করে। দেশের অবনতির কারণ সত্ত্বগুণের আতিশয্য নয়, রজোগুণের অভাব, তমোগুণের প্রাধান্য। রজোগুণের অভাবে আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্ব ম্লান হইয়া তমোমধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়িল। আলস্য, মোহ, অজ্ঞান, অপ্রবৃত্তি, নিরাশা, বিষাদ, নিশ্চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুর্দ্দশা অবনতিও

বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই মেঘ প্রথমে লঘু ও বিরল ছিল, কালের গতিতে ক্রমশঃ এতদূর নিবিড়তর হইয়া পড়িল, অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়া আমরা এমন নিশ্চেষ্ট ও মহতাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া পড়িলাম যে ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষগণের উদয়েও সেই অন্ধকার পূর্ণ তিরোহিত হইল না। তখন সূর্য্য-ভগবান রজোগুণজনিত প্রবৃত্তি দ্বারা দেশরক্ষার সঙ্কল্প করিলেন।

জাগ্রত রজঃশক্তি প্রচণ্ডভাবে কার্য্যকরী হইলে তমঃ পলায়নোদ্যত হয় বটে কিন্তু অন্য-দিকে স্বেচ্ছাচার, কুপ্রবৃত্তি ও উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি আসুরিক ভাব আসিবার আশঙ্কা। রজঃ-শক্তি যদি স্ব স্ব প্রেরণায় উন্মত্তার বিশাল প্রবৃত্তির উদরপূরণকেই লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে এই আশঙ্কার যথেষ্ট কারণও আছে। রজোগুণ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে স্বপথগামী হইলে অধিককাল টিঁকিতে পারে না, ক্লান্তি আসে, তমঃ আসে, প্রচণ্ড ঝটিকার পরে আকাশ

নির্ম্মল পরিষ্কার না হইয়া মেঘাচ্ছন্ন বায়ুস্পন্দন-রহিত হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে ফ্রান্সের এই পরিণাম হইয়াছে। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবে রজোগুণের ভীষণ প্রাদুর্ভাব, বিপ্লবান্তে তাম-সিকতার অল্পাধিক পুনরুত্থান, আবার রাষ্ট্রবিপ্লব, আবার ক্লান্তি, শক্তিহীনতা, নৈতিক অবনতি, ইহাই গত শতবর্ষে ফ্রান্সের ইতিহাস। যতবার সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতারূপ আদর্শজনিত সাত্ত্বিক প্রেরণা ফ্রান্সের প্রাণে জাগিয়াছে, ততবারই ক্রমশঃ রজোগুণ প্রবল হইয়া সত্ত্বসেবাবিমুখ আসুরিকভাবে পরিণতি লাভ করিয়া স্বপ্রবৃত্তি-পূরণে যত্নবান হইয়াছে। ফলতঃ, তমোগুণের পুনরাবির্ভাবে ফ্রান্স তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত মহাশক্তি হারাইয়া ম্রিয়মাণ বিষম অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রের মত না স্বর্গে না মর্ত্ত্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এইরূপ পরিণাম এড়াইবার একমাত্র উপায় প্রবল রজঃশক্তিকে সত্ত্বসেবায় নিযুক্ত করা। যদি সাত্ত্বিকভাব জাগ্রত হইয়া রজঃশক্তির

চালক হয়, তাহা হইলে তমোগুণের পুনঃ প্রাদুর্ভাবের ভয়ও নাই, উদ্দাম শক্তিও শৃঙ্খলিত নিয়ন্ত্রিত হইয়া উচ্চ আদর্শের বশে দেশের ও জগতের হিতসাধন করে। সত্ত্বোদ্রেকের উপায় ধর্ম্মভাব—স্বার্থকে ডুবাইয়া পরার্থে সমস্ত শক্তি অর্পণ—ভগবানকে আত্মসমর্পণ করিয়া সমস্ত জীবনকে এক মহা ও পবিত্র যজ্ঞে পরিণত করা। গীতায় কথিত আছে সত্ত্বরজঃ উভয়ে তমঃ নাশ করে; একা সত্ত্ব কখন তমঃকে পরাজয় করিতে পারে না। সেইজন্য ভগবান অধুনা ধর্ম্মের পুনরুত্থান করাইয়া আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বকে জাগাইয়া পরে রজঃশক্তিকে দেশময় ছড়াইয়া দিয়াছেন। রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশক মহাত্মাগণ সত্ত্বকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দিতে ধর্ম্মজগতে যেমন জাগরণ হইয়াছিল, রাজনীতি বা সমাজে তেমন হয় নাই। কারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না, সেইজন্য

প্রচুর বীজ বপিত হইয়াও শস্য দেখা দেয় নাই। ইহাতেও ভারতবর্ষের উপর ভগবানের দয়া ও প্রসন্নতা বুঝা যায়। রাজসিক ভাবপ্রসূত জাগরণ কখনও স্থায়ী বা পূর্ণ কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। তৎপূর্ব্বে জাতির অন্তরে কতকাংশে ব্রহ্মতেজ উদ্দীপিত হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য এতদিন রজঃশক্তির স্রোত রুদ্ধ ছিল। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে রজঃশক্তির যে বিকাশ হইয়াছে তাহা সাত্ত্বিকভাব পূর্ণ। এই নিমিত্ত ইহাতে যে উদ্দামভাব দেখা গিয়াছে তাহাতেও আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই, কেননা ইহা রজঃসাত্ত্বিকের খেলা ; এ খেলায় যাহা কিছু উদ্দাম বা উচ্ছৃঙ্খল ভাব তাহা অচিরে নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত হইবেই। বাহ্যশক্তি দ্বারা নহে, ভিতরে যে ব্রহ্মতেজ, যে সাত্ত্বিকভাব, তাহা দ্বারাই ইহা বশীভূত ও নিয়মিত হইবে। ধর্ম্মভাব প্রচার করিয়া আমরা সেই ব্রহ্মতেজ ও সাত্ত্বিকভাবের পোষকতা করিতে পারি মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরার্থে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা সত্ত্বোদ্রেকের এক উপায়। আর আমাদের রাজনীতিক জাগরণে এই ভাবের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই ভাব রক্ষা করা কঠিন। যেমন ব্যক্তির পক্ষে কঠিন জাতির পক্ষে আরও কঠিন। পরার্থের মধ্যে স্বার্থ অলক্ষিত ভাবে ছুটিয়া আসে এবং যদি আমাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ না হয়, এমন ভ্রমে পতিত হইতে পারি যে আমরা পরার্থের দোহাই দিয়া স্বার্থকে আশ্রয় করিয়া পরহিত, দেশহিত, মনুষ্যজাতির হিত ডুবাইব অথচ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিব না। ভগবৎসেবা সত্ত্বোদ্রেকের অন্য উপায়। কিন্তু সেই পথেও হিতে বিপরীত হইতে পারে, ভগবৎসান্নিধ্যরূপ আনন্দ পাইয়া আমাদের সাত্ত্বিক-নিশ্চেষ্টতা জন্মিতে পারে, সেই আনন্দের আস্বাদ ভোগ করিতে করিতে দুঃখ-কাতর দেশের প্রতি ও মানবজাতির সেবায় পশ্চাৎমুখ হইতে পারি। ইহাই সাত্ত্বিকভাবের

বন্ধন। যেমন রাজসিক অহঙ্কার আছে, তেমনি সাত্ত্বিক অহঙ্কারও আছে। যেমন পাপ মনুষ্যকে বদ্ধ করে, তেমনই পুণ্যও বদ্ধ করে। সম্পূর্ণ বাসনাশূন্য হইয়া অহঙ্কার ত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানকে আত্মসমর্পণ না করিলে পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। এই দুটি অনিষ্ট ত্যাগ করিতে হইলে প্রথম বিশুদ্ধ বুদ্ধির দরকার। দেহাত্মক বুদ্ধি বর্জ্জন করিয়া মানসিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করাই বুদ্ধি-শোধনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা। মন স্বাধীন হইলে জীবের আয়ত্ত হয়, পরে মনকে জয় করিয়া বুদ্ধির আশ্রয়ে মানুষ স্বার্থের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ লাভ করে। ইহাতেও স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে আমাদিগকে ত্যাগ করে না। শেষ স্বার্থ মুমুক্ষুত্ব, পরদুঃখকে ভুলিয়া নিজের আনন্দে ভোর হইয়া থাকিবার ইচ্ছা। ইহাও ত্যাগ করিতে হয়। সর্ব্বভূতে নারায়ণকে উপলব্ধি করিয়া সেই সর্ব্বভূতস্থ নারায়ণের সেবা ইহার ঔষধ ; ইহাই সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠা।

ইহা হইতেও উচ্চতর অবস্থা আছে, তাহা সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করিয়া গুণাতীত হইয়া সম্পূর্ণভাবে ভগবানকে আশ্রয় করা। গুণাতীত্যের বর্ণনা গীতায় কথিত আছে, যেমন—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

"যখন জীব সাক্ষী হইয়া গুণত্রয় অর্থাৎ ভগবানের ত্রৈগুণ্যময়ী শক্তিকেই একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া দেখে এবং এই গুণত্রয়েরও উপর শক্তির প্রেরক ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তখন সে-ই ভগবৎ সাধর্ম্ম লাভ করে। তখন দেহস্থ জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার দেহসম্ভূত গুণ-ত্রয়কে অতিক্রম করিয়া জন্ম-মৃত্যু জরা-দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমরত্ব ভোগ করে। সত্ত্বজনিত জ্ঞান, রজোজনিত প্রবৃত্তি বা তমো-জনিত নিদ্রা নিশ্চেষ্টা ভ্রমস্বরূপ মোহ আসিলে বিরক্ত হয় না, এই গুণত্রয়ের আগমন নির্গমনে সমান ভাব রাখিয়া উদাসীনের ন্যায় স্থির হইয়া থাকে, গুণগ্রাম তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, এই সবই গুণের স্বধর্ম্মজাত বৃত্তি বলিয়া দৃঢ় থাকে। যাহার পক্ষে সুখ-দুঃখ সমান, প্রিয়-অপ্রিয় সমান, নিন্দা-স্তুতি সমান, কাঞ্চন-লোষ্ট্র উভয়ই প্রস্তরের তুল্য, যে ধীর-স্থির, নিজের মধ্যে অটল, যাহার নিকট মান-অপমান একই,

মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ সমান প্রিয়, যে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্যারম্ভ করে না, সকল কর্ম্ম ভগবানকে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই প্রেরণায় কর্ম্ম করে, তাহাকেই গুণাতীত বলে। যে আমাকে নির্দ্দোষ ভক্তিযোগে সেবা করে, সে-ই এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত হয়।”

এই গুণাতীত অবস্থা লাভ সকলের সাধ্য না হইলেও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা লাভ সত্ত্বপ্রধান পুরুষের অসাধ্য নহে। সাত্ত্বিক অহঙ্কারকে ত্যাগ করিয়া জগতের সকল কার্য্যে ভগবানের ত্রৈগুণ্যময়ী শক্তির লীলা দেখা ইহার সর্ব্ব প্রথম উপক্রম। ইহা বুঝিয়া সাত্ত্বিক কর্ত্তা কর্ত্তৃত্ব-অভিমান ত্যাগে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করেন।

গুণত্রয় ও গুণাতীত্য সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা গীতার মূল কথা। কিন্তু এই শিক্ষা সাধারণতঃ গৃহীত হয় নাই, আজ পর্য্যন্ত যাহাকে

আমরা আর্য্যশিক্ষা বলি, তাহা প্রায় সাত্ত্বিক গুণের অনুশীলন। রজোগুণের আদর এই দেশে ক্ষত্রিয়জাতির লোপে লুপ্ত হইয়াছে। অথচ জাতীয় জীবনে রজঃশক্তিরও নিরতিশয় প্রয়োজন আছে। সেই জন্য গীতার দিকে লোকের মন আজকাল আকৃষ্ট হইয়াছে। গীতার শিক্ষা পুরাতন আর্য্যশিক্ষাকে ভিত্তি করিয়াও অতিক্রম করিয়াছে। গীতোক্ত ধর্ম্ম রজোগুণকে ভয় করে না, তাহাতে রজঃশক্তিকে সত্ত্বসেবায় নিযুক্ত করিবার পন্থা আছে, প্রবৃত্তি মার্গে মুক্তির উপায় প্রদর্শিত আছে। এই ধর্ম্ম অনুশীলনের জন্য জাতির মন কিরূপে প্রস্তুত হইতেছে, তাহা জেলেই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। এখনও স্রোত নির্ম্মল হয় নাই, এখনও কলুষিত ও আবিল, কিন্তু অতিরিক্ত বেগ যখন অল্প প্রশমিত হইবে, তখন তাহার মধ্যে যে বিশুদ্ধ শক্তি লুক্কায়িত, তাহার নিখুঁত কার্য্য হইবে।

যাঁহারা আমার সঙ্গে বন্দী ও এক অভিযোগে অভিযুক্ত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি পাইয়াছেন, আর সকলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া দণ্ডিত। মানবসমাজে হত্যা হইতে গুরুতর অপরাধ হইতে পারে না। জাতীয় স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া যে হত্যা করে, তাহার ব্যক্তিগত চরিত্র কলুষিত না হইতে পারে কিন্তু তাহাতে সামাজিক হিসাবে অপরাধীর গুরুত্ব লাঘব হইল না। ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে হত্যার ছায়া অন্তরাত্মায় পড়িলে মনে যেন রক্তের দাগ বসিয়া থাকে, ক্রূরতার সঞ্চার হয়। ক্রূরতা বর্ব্বরোচিত গুণ, মনুষ্য উন্নতির ক্রম-বিকাশে যে সকল গুণ হইতে অল্পে অল্পে বর্জ্জিত হইতেছে, সেই সকলের মধ্যে ক্রূরতা প্রধান। ইহা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে পারিলে মানব-জাতির উন্নতির পথে একটি বিঘ্নকর কণ্টক উন্মূলিত হইয়া যাইবে। আসামীর দোষ

ধরিয়া লইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ইহা রজঃশক্তির ক্ষণিক উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। তাহাদের মধ্যে এমন সাত্ত্বিক শক্তি নিহিত যে এই ক্ষণিক উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা দেশের স্থায়ী অমঙ্গল সাধিত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

অন্তরের যে স্বাধীনতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার সঙ্গীগণের সে স্বাধীনতা স্বভাবসিদ্ধ গুণ। যে কয়েকদিন আমরা একসঙ্গে এক বৃহৎ দালানে রক্ষিত ছিলাম, আমি তাঁহাদের আচরণ ও মনের ভাব বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। দুইজন ভিন্ন কাহারও মুখে বা কথায় ভয়ের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। প্রায় সকলেই তরুণ বয়স্ক, অনেকে অল্প বয়স্ক বালক, যে অপরাধে ধৃত সাব্যস্ত হইলে তাহার দণ্ড যেরূপ ভীষণ তাহাতে দৃঢ়মতি পুরুষেরও বিচলিত হইবার কথা। আর ইঁহারা বিচারে খালাস হইবার আশাও বড় রাখিতেন না। বিশেষতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে সাক্ষী

লেখাসাক্ষ্যের যেরূপ ভীষণ আয়োজন জমিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আইন-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে সহজেই ধারণা হয় যে, নির্দ্দোষীরও এই ফাঁদ হইতে নির্গমনের পথ নাই। অথচ তাঁহাদের মুখে ভীতি বা বিষণ্ণতার পরিবর্ত্তে কেবল প্রফুল্লতা, সরল হাস্য, নিজের বিপদকে ভুলিয়া ধর্ম্মের ও দেশের কথা। আমাদের ওয়ার্ডে প্রত্যেকের নিকট দুই-চারিখানি বই থাকায় একটি ক্ষুদ্র লাইব্রেরী জমিয়াছিল। এই লাইব্রেরীর অধিকাংশই ধর্ম্মের বই, গীতা, উপনিষদ, বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী, রামকৃষ্ণের কথামৃত ও জীবনচরিত, পুরাণ, স্তবমালা, ব্রহ্ম-সঙ্গীত ইত্যাদি। অন্য পুস্তকের মধ্যে বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী, স্বদেশী গানের অনেক বই, আর য়ূরোপীয় দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক অল্পস্বল্প পুস্তক। সকালে কেহ কেহ সাধনা করিতে বসিত, কেহ কেহ বই পড়িত, কেহ কেহ আস্তে গল্প করিত। সকালের এই শান্তিময়

নীরবতায় মাঝে মাঝে হাসির লহরীও উঠিত। "কাচেরী" না থাকিলে কেহ কেহ ঘুমাইত, কেহ কেহ খেলা করিত—যে দিন যে খেলা জোটে, আসক্তি কাহারও নাই। কোন দিন মণ্ডলে বসিয়া কোন শান্ত খেলা—কোন দিন বা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি, দিন কতক ফুটবল চলিল, ফুটবলটা অবশ্য অপূর্ব্ব উপকরণে গঠিত। দিন কতক কাণামাছিই চলিল; এক একদিন ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করিয়া একদিকে জুজিৎষু শিক্ষা অন্য দিকে উচ্চ লম্ফ ও দীর্ঘ লম্ফ আর একদিকে drafts বা দশপঁচিশ। দুই চারিজন গম্ভীর প্রৌঢ় লোক ভিন্ন সকলেই প্রায় বালক-দের অনুরোধে এই সকল খেলায় যোগ দিতেন। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে বয়স্ক লোকেরও বাল-স্বভাব। সন্ধ্যাবেলায় গানের মজলিস জমিত। উল্লাস, শচীন্দ্র, হেমদাস, যাহারা গানে সিদ্ধ, তাহাদের চারিদিকে আমরা সকলে বসিয়া গান শুনিতাম। স্বদেশী বা ধর্ম্মের গান ব্যতীত অন্য

কোনরূপ গান হইত না। এক একদিন কেবল আমোদ করিবার ইচ্ছায় উল্লাসকর হাসির গান, অভিনয়, Ventriloquism, অনুকরণ বা গেঁজেলের গল্প করিয়া সন্ধ্যা কাটাইত। * * * * * * মোকদ্দমায় কেহ মন দিত না, সকলেই ধর্ম্মে বা আনন্দে দিন কাটাইত। এই নিশ্চিন্ত ভাব কঠিন কুক্রিয়াভ্যস্ত হৃদয়ের পক্ষে অসম্ভব; তাহাদের মধ্যে কাঠিন্য, ক্রূরতা, কুক্রিয়াসক্তি, কুটিলতা লেশমাত্র ছিল না। কি হাস্য কি কথা কি খেলা তাহাদের সকলই আনন্দময়, পাপহীন, প্রেমময়।

এই মানসিক স্বাধীনতার ফল অচিরে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপ ক্ষেত্রেই ধর্ম্মবীজ বপন হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ফল সম্ভবে। যীশু কয়েকজন বালককে দেখাইয়া শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন "যাঁহারা এই বালকের তুল্য, তাঁহারাই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।" জ্ঞান ও আনন্দ সত্ত্বগুণের লক্ষণ। যাঁহারা দুঃখকে দুঃখ

জ্ঞান করেন না, যাঁহারা সকল অবস্থায় আনন্দিত প্রফুল্লিত, তাঁহাদেরই যোগে অধিকার। জেলে রাজসিক ভাব প্রশ্রয় পায় না, আর নির্জ্জন কারাগারে প্রবৃত্তির পরিপোষক কিছুই নাই। এই অবস্থায় অসুরের মন চিরাভ্যস্ত রজঃশক্তির উপকরণের অভাবে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় নিজেকে নাশ করে। পাশ্চাত্য কবিগণ যাহাকে Eating one's own heart বলেন, সেই অবস্থা ঘটে। ভারতবাসীর মন সেই নির্জ্জনতায়, সেই বাহ্যিক কষ্টের মধ্যে চিরন্তন টানে আকৃষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট ছুটিয়া যায়। আমাদের ইহাই ঘটিয়াছে। জানি না কোথা হইতে একটি স্রোত আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া নিয়া গেল। যে কখনও ভগবানের নাম করে নাই, সেও সাধনা করিতে শিখিল। আর সেই পরম দয়ালুর দয়া অনুভব করিয়া আনন্দমগ্ন হইয়া পড়িল। অনেক দিনের অভ্যাসে যোগীর যাহা হয়, এই বালকদের দু'চারি মাসের সাধনায়

তাহা হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার বলিয়াছিলেন, "এখন তোমরা কি দেখ্‌ছ—ইহা কিছুই নয়, দেশে এমন স্রোত আস্‌ছে যে, অল্প বয়সের ছেলে তিন দিন সাধনা করে' সিদ্ধি পাবে।" এই বালকদিগকে দেখিলে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র থাকে না। ইহারা যেন সেই প্রত্যাশিত ধর্ম্মপ্রবাহের মূর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপরিচয়; এই সাত্ত্বিকভাবের তরঙ্গ কাঠগড়া বহিয়া চারপাঁচজন ভিন্ন অন্য সকলের হৃদয় মহানন্দে আপ্লুত করিয়া তুলিত। ইহার আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে সে কখনও তাহা ভুলিতে পারে না এবং কখনও অন্য আনন্দকে ইহার তুল্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। এই সাত্ত্বিকভাবই দেশের উন্নতির আশা। ভ্রাতৃভাব, আত্মজ্ঞান, ভগবৎ প্রেম যেমন সহজে ভারতবাসীর মনকে অধিকার করিয়া কার্য্যে প্রকাশ পায়, আর কোনও জাতির তেমন সহজে হওয়া সম্ভব নয়। চাই

তমোবর্জ্জন, রজোদমন, সত্ত্বপ্রকাশ। ভারত-বর্ষের জন্য ভগবানের গূঢ় অভিসন্ধিতে তাহাই প্রস্তুত হইতেছে।

হিরোবুমি ইতো

মানবজাতির মধ্যে দুই প্রকার জীব জন্মগ্রহণ করে। যাঁহারা আস্তে আস্তে ক্রম-বিকাশের স্রোতে অগ্রসর হইয়া অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য। যাঁহারা সেই ক্রম-বিকাশের সাহায্যার্থ বিভূতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র। তাঁহারা যে জাতির মধ্যে ও যে যুগে অবতরণ করেন, সেই জাতির চরিত্র ও আচার, সেই যুগের ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ঐশ্বরিক শক্তি ও স্বভাবের বলে সাধারণ মানবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিয়া জগতের গতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ইতিহাসে অমর নাম রাখিয়া স্বলোক গমন করেন।

তাঁহাদের কর্ম্ম ও চরিত্র মানুষের প্রশংসা ও নিন্দার অতীত। প্রশংসা করি বা নিন্দা করি, তাঁহারা ভগবদ্-দত্ত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, মানবজাতির ভবিষ্যৎ সেই কার্য্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট পথে খরস্রোতে বহিবে। সীজার, নেপোলিয়ন, আকবর,শিবাজী এইরূপ বিভূতি। জাপানের মহাপুরুষ হিরোবূমি ইতোও এই শ্রেণীর ভুক্ত এবং যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের একজনও গুণে, প্রতিভায় বা কর্ম্মের মহত্ত্বে ও ভবিষ্যৎ ফলে ইতোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। ইতোর ইতিহাসে ও জাপানের অভ্যুদয়ে তাঁহার প্রধান স্থান সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু সকলেই না-ও জানিতে পারেন যে ইতোই সেই অভ্যুদয়ের ক্রম, উপায় ও উদ্দেশ্য উদ্ভাবনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত একা এই মহৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, জাপানের আর সকল মহাপুরুষ তাঁহার হস্তের যন্ত্র মাত্র। ইতোই জাপানের ঐক্য, জাপানের স্বাধীনতা,

জাপানের বিদ্যাবল, সৈন্যবল, নৌসেনাবল, অর্থবল, বাণিজ্য, রাজনীতি মনে কল্পনা করিয়া কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনিই ভাবী জাপানের সাম্রাজ্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। যাহা করিয়াছেন, প্রায়ই অন্তরালে দাঁড়াইয়া করিয়াছেন। জার্ম্মাণীর কাইসার ওয়িলহেম বা বিলাতের লয়েড জর্জ্জ যাহা করিতেছেন, যাহা ভাবিতেছেন, সমস্ত জগৎ তখনই তাহা জানিতে পারে। ইতো যাহা ভাবিতেছিলেন, যাহা করিতেছিলেন, কেহ জানিত না—যখন তাঁহার নিভৃত কল্পনা ও চেষ্টা ফলীভূত হইল, তখন জগৎ বিস্মিত হইয়া বুঝিতে পারিল, ইহাই এতদিন প্রস্তুত হইতেছিল। অথচ কি প্রকাণ্ড কার্য্য, কি অদ্ভুত প্রতিভা সেই কার্য্যে প্রকাশ পাইতেছে! যদি ইতো নিজে মনের কল্পনা করিতে অভ্যস্ত হইতেন, সমস্ত জগৎ পদে পদে তাঁহাকে উন্মত্ত অসাধ্য-সাধন-প্রয়াসী ও ব্যর্থ-স্বপ্নের অনুরক্ত Idealist বলিয়া উপহাস করিত।

কে বিশ্বাস করিত যে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জাপান দুর্লভ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা আয়ত্ত করিবে, ইংলণ্ড জার্ম্মাণী ফ্রান্সের সমকক্ষ প্রবল পরাক্রমশালী জাতি হইবে, চীনকে পরাভূত করিবে, রুষকে পরাভূত করিবে, দূর দেশ-বিদেশে জাপানী বাণিজ্য, জাপানী চিত্রকলা, জাপানী বুদ্ধির প্রশংসা ও জাপানী সাহসের ভয় বিস্তার করিবে, কোরিয়া অধিকার করিবে, ফারমোজা অধিকার করিবে, বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিবে, একতা, স্বাধীনতা, সাম্য, জাতীয় শিক্ষার চরম উন্নতি সাধিত করিবে। নেপোলিয়ন বলিতেন, আমার শব্দকোষে অসাধ্য কথা বাদ দিয়াছি। ইতো সেই কথা বলেন নাই, কিন্তু কার্য্যে তাহাই করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের কার্য্য অপেক্ষা ইতোর কার্য্য বড়। এইরূপ মহাপুরুষ হত্যা-কারীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন, ইহাতে কাহারও দুঃখ করিবার কারণ নাই। যিনি

জাপানের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, জাপানই যাঁহার চিন্তা, জাপানই যাঁহার উপাস্য দেবতা, তিনি জাপানের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহা বড় সুখের কথা, সৌভাগ্যের কথা, গৌরবের কথা। হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। হিরোবুমি ইতোর ভাগ্যে এই দুইটি পরম ফল এক জীবন-বৃক্ষে পাওয়া গেল।

দুর্গা-স্তোত্র

মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনি সর্ব্বশক্তিদায়িনি মাতঃ শিবপ্রিয়ে! তোমার শক্ত্যংশজাত আমরা বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থনা করিতেছি,—শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! যুগে যুগে মানবশরীরে অবতীর্ণ হইয়া জন্মে জন্মে তোমারই কার্য্য করিয়া তোমার আনন্দধামে ফিরিয়া যাই। এইবারও জন্মিয়া তোমারই কার্য্যে ব্রতী আমরা, শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, সহায় হও ॥

মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনি, ত্রিশূলধারিণি, বর্ম্ম-আবৃত-সুন্দর-শরীরে মাতঃ জয়দায়িনি! তোমার প্রতীক্ষায় ভারত রহিয়াছে, তোমার সেই মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি দেখিতে উৎসুক। শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! বলদায়িনি, প্রেমদায়িনি, জ্ঞানদায়িনি, শক্তিস্বরূপিণি ভীমে, সৌম্য-রৌদ্র-রূপিণি! জীবন-সংগ্রামে ভারত-সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, দাও, মাতঃ, প্রাণে মনে অসুরের শক্তি, অসুরের উদ্যম, দাও, মাতঃ হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের জ্ঞান॥

মাতঃ দুর্গে! জগৎশ্রেষ্ঠ ভারতজাতি নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। তুমি, মাতঃ, গগনপ্রান্তে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছ, তোমার স্বর্গীয় শরীরের তিমির বিনাশী আভায় উষার প্রকাশ হইল। আলোক বিস্তার কর, মাতঃ, তিমির বিনাশ কর॥

মাতঃ দুর্গে! শ্যামলা সর্ব্বসৌন্দর্য্য-অলঙ্কৃতা জ্ঞান প্রেম শক্তির আধার বঙ্গভূমি তোমার বিভূতি, এতদিন শক্তিসংহরণে আত্মগোপন করিতেছিল। আগত যুগ, আগত দিন, ভারতের ভার স্কন্ধে লইয়া বঙ্গজননী উঠিতেছে, এস, মাতঃ, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! তোমার সন্তান আমরা, তোমার প্রসাদে, তোমার প্রভাবে মহৎ কার্য্যের মহৎ ভাবের উপযুক্ত হই। বিনাশ কর ক্ষুদ্রতা, বিনাশ কর স্বার্থ, বিনাশ কর ভয়॥

মাতঃ দুর্গে! কালীরূপিণি, নৃমুণ্ডমালিনি দিগম্বরি, কৃপাণপাণি দেবি অসুরবিনাশিনি! ক্রূরনিনাদে অন্তঃস্থ রিপু বিনাশ কর। একটিও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে, বিমল নির্ম্মল যেন হই, এই প্রার্থনা, মাতঃ, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! স্বার্থে ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় ম্রিয়মাণ ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎ-প্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্যসঙ্কল্প কর। আর অল্পাশী, নিশ্চেষ্ট, অলস, ভয়ভীত যেন না হই॥

মাতঃ দুর্গে! যোগশক্তি বিস্তার কর। তোমার প্রিয় আর্য্য-সন্তান, লুপ্ত শিক্ষা, চরিত্র, মেধাশক্তি, ভক্তিশ্রদ্ধা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য-জ্ঞান আমাদের মধ্যে বিকাশ করিয়া জগৎকে বিতরণ কর। মানব সহায়ে দুর্গতিনাশিনি জগদম্বে, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! অন্তঃস্থ রিপু সংহার করিয়া বাহিরের বাধা-বিঘ্ন নির্ম্মূল কর। বলশালী পরাক্রমী উন্নতচেতা জাতি ভারতের পবিত্র কাননে, উর্ব্বর ক্ষেত্রে, গগনসহচর পর্ব্বততলে, পূতসলিলা নদীতীরে একতায় প্রেমে, সত্যে

শক্তিতে, শিল্পে সাহিত্যে, বিক্রমে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়া নিবাস করুক, মাতৃচরণে এই প্রার্থনা, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! আমাদের শরীরে যোগবলে প্রবেশ কর। যন্ত্র তব, অশুভ-বিনাশী তরবারী তব, অজ্ঞান-বিনাশী প্রদীপ তব আমরা হইব, বঙ্গীয় যুবকগণের এই বাসনা পূর্ণ কর। যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও, অশুভ-হন্ত্রী হইয়া তরবারী ঘুরাও, জ্ঞানদীপ্তিপ্রকাশিনী হইয়া প্রদীপ ধর, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! তোমাকে পাইলে আর বিসর্জ্জন করিব না, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিব। এস মাতঃ, আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও ॥

বীরমার্গপ্রদর্শিনি, এস! আর বিসর্জ্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবচ্ছিন্ন

দুর্গাপূজা, আমাদের সর্ব্ব কার্য্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবাব্রত হউক, এই প্রার্থনা, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও॥

স্বপ্ন

একটি দরিদ্র লোক অন্ধকার কুটরীতে বসিয়া নিজ শোচনীয় অবস্থা এবং ভগবানের রাজ্যে অন্যায় ও অবিচারের কথা ভাবিতেছিল। দরিদ্র অভিমানের বশীভূত হইয়া বলিতে লাগিল, "লোকে কর্ম্মের দোহাই দিয়া ভগবানের সুনাম বাঁচাইতে চায়। গত জন্মের পাপে যদি আমার এই দুর্দ্দশা হইত, আমি যদি এতই পাপী হইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় এই জন্মে আমার মনে পাপ চিন্তার স্রোত এখনও বহিত, এত ঘোর পাতকীর মন কি একদিনে নির্ম্মল হয়? আর ওই পাড়ার তিনকড়ি শীল, তাঁহার যে ধন দৌলত স্বর্ণরৌপ্য দাসদাসী কর্ম্মফল সত্য হইলে

নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মে তিনি জগদ্বিখ্যাত সাধু মহাত্মা ছিলেন, কিন্তু কই তাহার চিহ্ন মাত্রও এই জন্মে দেখি না। এমন নিষ্ঠুর পাজী বদ্মায়েস জগতে নাই। না, কর্ম্মবাদ ভগবানের ফাঁকি, মনভুলান কথা মাত্র। শ্যামসুন্দর বড় চতুর চূড়ামণি, আমার কাছে ধরা দেন না, তাই রক্ষা—নচেৎ উত্তম শিক্ষা দিয়া সব চালাকী বাহির করিতাম।” এই কথা বলিবা মাত্র দরিদ্র দেখিল হঠাৎ তাহার অন্ধকার ঘর অতিশয় উজ্জ্বল আলোকতরঙ্গে ভাসিয়া গেল, অল্পক্ষণ পরে আলোকতরঙ্গ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, আর সে দেখিল তাহার সম্মুখে একটি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক প্রদীপ হাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—মৃদু হাসিতেছে, কিন্তু কোনও কথা কহিতেছে না! ময়ূরপুচ্ছ ও পায়ে নূপুর দেখিয়া দরিদ্র বুঝিল স্বয়ং শ্যামসুন্দর আসিয়া তাহাকে ধরা দিয়াছেন। দরিদ্র অপ্রতিভ হইল, একবার ভাবিল প্রণাম করি, কিন্তু বালকের হাসিমুখ দেখিয়া

কিছুতেই প্রণাম করিবার প্রবৃত্তি হইল না,—শেষে মুখ হইতে এই কথাই বাহির হইয়া গেল "ওরে কেষ্টা, তুই এলি কেন?" বালক হাসিয়া বলিল, "কেন, তুমি আমাকে ডাকিলে না? এইমাত্র আমাকে চাবুক মারিবার প্রবল বাসনা তোমার মনে ছিল! তা, ধরা দিলাম, উঠিয়া চাবকাও না।" দরিদ্র আরও অপ্রতিভ হইল, ভগবানকে চাবুক মারিবার ইচ্ছার জন্য অনুতাপ নহে, কিন্তু স্নেহের পরিবর্ত্তে এমন সুন্দর বালকের গায়ে হাত লাগানটা ঠিক রুচি সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। বালক আবার বলিল, "দেখ, হরিমোহন, যাহারা আমাকে ভয় না করিয়া সখার মত দেখে, স্নেহভাবে গাল দেয়, আমার সঙ্গে খেলা করিতে চায়, তাহারা আমার বড় প্রিয়। আমি খেলার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সর্ব্বদা খেলার উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজিতেছি। কিন্তু, ভাই, পাইতেছি না। সকলে আমার উপর ক্রোধ করে, দাবী করে, দান চায়, মান চায়, মুক্তি চায়, ভক্তি চায়,

কই আমাকে ত কেহ চায় না। যাহা চায়, আমি দিই। কি করিব সন্তুষ্টই করিতে হয়, নহিলে আমাকে ছিঁড়িয়া খাইবে। তুমিও দেখিতেছি, কিছু চাও। বিরক্ত হইয়া চাবকাই-বার লোক চাও, আমাকে সেই সাধ মিটাইবার জন্য ডাকিয়াছ। চাবুকের প্রহার খাইতে আসিয়াছি—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে। তবে যদি প্রহারের আগে আমার মুখে শুনিতে চাও, আমার প্রণালী বুঝাইয়া দিব। কেমন রাজী আছ?" হরিমোহন বলিল, "পারিবি ত? দেখিতেছি বড় বকিতে জানিস, কিন্তু তোর মত কচি ছেলে যে আমাকে কিছু শিখাইতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করিব কেন?" বালক আবার হাসিয়া বলিল, "এস, দেখ, পারি কি না।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হরিমোহনের মাথায় হাত দিলেন। তখনই দরিদ্রের সর্ব্ব শরীরে বিদ্যুতের স্রোত খেলিতে লাগিল, মূলাধারে সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তি অগ্নিময়ী ভূজঙ্গিনীর

আকারে গর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে ছুটিয়া আসিল, মস্তিষ্ক প্রাণশক্তির তরঙ্গে ভরিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে হরিমোহনের চারিধারে ঘরের দেওয়াল যেন দূরে পলাইতে লাগিল, নামরূপময় জগৎ যেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তে লুক্কায়িত হইল। হরিমোহন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইল। যখন আবার চৈতন্য হইল, সে দেখিল কোন অচেনা বাড়ীতে বালকের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে, সম্মুখে গদীতে বসিয়া গালে হাত দিয়া একজন বৃদ্ধ প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সেই ঘোর দুশ্চিন্তা বিকৃত হৃদয়বিদারক নিরাশা বিমর্ষ মুখমণ্ডল দেখিয়া হরিমোহন বিশ্বাস করিতে চায় নাই যে এই বৃদ্ধ গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা তিনকড়ি শীল। শেষে অতিশয় ভীত হইয়া বালককে বলিল, "কি করিলি কেষ্টা, চোরের মত ঘোর রাত্রিতে পরের বাড়ীতে ঢুকিলি? পুলিশ আসিয়া ধরিয়া প্রহারের চোটে দুইজনের প্রাণ বাহির করিবে যে! তিনকড়ি শীলের প্রতাপ

জানিস না?” বালক হাসিয়া বলিল, “খুব জানি। কিন্তু চুরি আমার পুরাতন ব্যবসা, পুলিশের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে, ভয় নাই। এখন তোমাকে সূক্ষ্মদৃষ্টি দিলাম, বৃদ্ধের মনের ভিতর দেখ। তিনকড়ির প্রতাপ জান, আমার প্রতাপও দেখ।” তখন হরিমোহন বৃদ্ধ তিনকড়ির মন দেখিতে পাইল। দেখিল, যেন শত্রু-আক্রমণে বিধ্বস্ত ধনাঢ্য নগরী, সেই তীক্ষ্ণ ওজস্বিনী বুদ্ধিতে কত ভীষণ মূর্ত্তি পিশাচ ও রাক্ষস প্রবেশ করিয়া শান্তি বিনাশ করিতেছে, ধ্যানভঙ্গ করিতেছে, সুখ লুণ্ঠন করিতেছে। বৃদ্ধ প্রিয় কনিষ্ঠপুত্রের সঙ্গে কলহ করিয়াছেন, তাড়াইয়া দিয়াছেন; বৃদ্ধকালের স্নেহের পুত্রকে হারাইয়া শোকে ম্রিয়মাণ, অথচ ক্রোধ, গর্ব্ব, হঠকারিতা হৃদয়দ্বারে অর্গল দিয়া শান্ত্রী হইয়া বসিয়া আছে। ক্ষমার প্রবেশ নিষেধ করিতেছে। কন্যার নামে দুশ্চরিত্রা বলিয়া কলঙ্ক রটিয়াছে, বৃদ্ধ তাঁহাকে বাড়ী হইতে

তাড়াইয়া প্রিয়কন্যার জন্য কাঁদিতেছেন ; বৃদ্ধ জানেন সে নির্দোষ, কিন্তু সমাজের ভয়, লোক-লজ্জা, অহঙ্কার, স্বার্থ স্নেহকে চাপিয়া ধরিয়াছে। সহস্র পাপের স্মৃতিতে বৃদ্ধ ভীত হইয়া বারবার চমকিয়া উঠিতেছে, তথাপি পাপ প্রবৃত্তির সংস্কারে সাহস বা বল নাই। মাঝে মাঝে মৃত্যু ও পরলোকের চিন্তা বৃদ্ধকে অতি নিদারুণ বিভীষিকা দেখাইতেছে। হরিমোহন দেখিল, মরণ-চিন্তার পশ্চাৎ হইতে বিকট যমদূত কেবলই উঁকি মারিতেছে ও কপাটে ঠক্ ঠক্ করিতেছে। যতবার এইরূপ শব্দ হয় বৃদ্ধের অন্তরাত্মা ভয়ে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া হরিমোহন আতঙ্কে বালকের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ কিরে কেষ্টা, আমি ভাবিতাম বৃদ্ধ পরম সুখী।" বালক বলিল, "ইহাই আমার প্রতাপ। বল দেখি কাহার প্রতাপ বেশী, ও-পাড়ার তিনকড়ি শীলের, না বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীকৃষ্ণের ? দেখ, হরিমোহন,

আমারও পুলিশ আছে, পাহারা আছে, গবর্ণমেণ্ট আছে, আইন আছে, বিচার আছে, আমিও রাজা সাজিয়া খেলা করিতে পারি, এই খেলা কি তোমার ভাল লাগে।" হরিমোহন বলিল, "না বাবা। এ ত বড় বদ্ খেলা। তোর বুঝি ভাল লাগে?" বালক হাসিয়া বলিল, "আমার সব খেলা ভাল লাগে। চাবকাইতেও ভালবাসি, চাবুক খাইতেও ভালবাসি।" তাহার পর বলিল, "দেখ হরিমোহন তোমরা কেবল বাহিরটা দেখ, ভিতরটা দেখিবার সূক্ষ্মদৃষ্টি এখনও বিকাশ কর নাই। সেইজন্যই বল, তুমি দুঃখী, আর তিনকড়ি সুখী। এই লোকটির কোনই পার্থিব অভাব নাই—অথচ তোমার অপেক্ষা এই লক্ষপতি কত অধিক দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কেন, বলিতে পার? মনের অবস্থায় সুখ, মনের অবস্থায় দুঃখ। সুখ দুঃখ মনের বিকার মাত্র। যাহার কিছু নাই বিপদই যাহার সম্পত্তি, ইচ্ছা করিলে সে বিপদের মধ্যেও পরম সুখী হইতে

পারে। আবার দেখ তুমি যেমন নীরস পুণ্যে দিন কাটাইয়া সুখ পাইতেছ না, কেবল দুঃখ চিন্তা করিতেছ, ইনিও সেইরূপ নীরস পাপে দিন কাটাইয়া কেবলই দুঃখ চিন্তা করেন। তাই পুণ্যের ক্ষণিক সুখ ও পাপের ক্ষণিক দুঃখ বা পুণ্যের ক্ষণিক দুঃখ পাপের ক্ষণিক সুখ। এই দ্বন্দ্বে আনন্দ নাই। আনন্দ আগারের ছবি আমার কাছে; আমার কাছে যে আসে, যে আমার প্রেমে পড়ে, আমাকে সাধে, আমার উপর জোর করে, অত্যাচার করে—সে আমার আনন্দের ছবি আদায় করে।" হরিমোহন আগ্রহপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে লাগিল। বালক আবার বলিল, "আর দেখ হরিমোহন, শুষ্ক পুণ্য তোমার নিকট নীরস হইয়া পড়িয়াছে অথচ সংস্কারের প্রভাব তুমি ছাড়িতে পার না; সেই তুচ্ছ অহঙ্কার জয় করিতে পার না। বৃদ্ধের নিকট পাপ নীরস হইয়া পড়িয়াছে অথচ সংস্কারের প্রভাবে তিনিও তাহা ছাড়িতে না পারিয়া—ইহজীবনে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে-

ছেন। ইহাকে পুণ্যের বন্ধন পাপের বন্ধন বলে। অজ্ঞানজাত সংস্কার সেই বন্ধনের রজ্জু। কিন্তু বৃদ্ধের এই নরক যন্ত্রণা বড় শুভ অবস্থা। তাহাতে তাহার পরিত্রাণ ও মঙ্গল হইবে।”

হরিমোহন এতক্ষণ নীরবে কথা শুনিতেছিল, এখন বলিল, “কেষ্টা, তোর কথা বড় মিঠে, কিন্তু আমার প্রত্যয় হইতেছে না। সুখ দুঃখ মনের বিকার হইতে পারে, কিন্তু বাহ্যিক অবস্থা তাহার কারণ। দেখ, ক্ষুধার জ্বালায় মন যখন ছট্‌ফট্‌ করে, কেহ কি পরম সুখী হইতে পারে? অথবা যখন রোগে বা যন্ত্রণায় শরীর কাতর হয়, তখন কি কেহ তোর কথা ভাবিতে পারে?” বালক বলিল, “এস, হরিমোহন, তাহাও তোমাকে দেখাইব। এই বলিয়া বালক আবার হরিমোহনের মাথায় হাত দিল, স্পর্শ অনুভব করিবামাত্র হরিমোহন দেখিল আর তিনকড়ি শীলের বাড়ী নাই, নির্জ্জন সুরম্য পর্ব্বতের বায়ুসেবিত শিখরে একজন সন্ন্যাসী

আসীন, ধ্যানে মগ্ন, চরণ প্রান্তে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র প্রহরীর ন্যায় শায়িত। ব্যাঘ্র দেখিয়া হরিমোহনের চরণদ্বয় অগ্রসর হইতে নারাজ হইল, কিন্তু বালক তাহাকে টানিয়া সন্ন্যাসীর নিকট লইয়া গেল। বালকের সঙ্গে জোরে না পারিয়া হরিমোহন অগত্যা চলিল। বালক বলিল, "দেখ হরিমোহন।" হরিমোহন চাহিয়া দেখিল, সন্ন্যাসীর মন তাহার চক্ষের সামনে খোলা খাতার মত রহিয়াছে, তাহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণ নাম সহস্রবার লেখা। সন্ন্যাসী নির্ব্বিকল্প সমাধির সিংহদ্বার পার হইয়া সূর্য্যালোকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন। আবার দেখিল, সন্ন্যাসী অনেকদিন অনাহারে রহিয়াছে, গত দুই দিন শরীর ক্ষুৎপিপাসায় বিশেষ কষ্ট পাইয়াছে। হরিমোহন বলিল, "এ কিরে কেষ্টা? বাবাজী তোকে এত ভালবাসেন, অথচ ক্ষুৎপিপাসা ভোগ করিতেছেন। তোর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই! এই নির্জ্জন

ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যে কে তাঁহাকে আহার দিবে!” বালক বলিল, “আমি দিব, কিন্তু আর এক মজা দেখ।” হরিমোহন দেখিল, ব্যাঘ্র উঠিয়া তাহার থাবার এক প্রহারে নিকটবর্ত্তী বল্মীক ভাঙ্গিয়া দিল। ক্ষুদ্র শত শত পিপীলিকা বাহির হইয়া ক্রোধে সন্ন্যাসীর গায়ে উঠিয়া দংশন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন, নিশ্চল, অটল। তখন বালক সন্ন্যাসীর কর্ণকুহরে অতি মধুর স্বরে একবার ডাকিল, “সখে!” সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিলেন। প্রথমে মোহ-জ্বালাময় দংশন অনুভব করেন না, তখনও কর্ণকুহরে সেই বিশ্ববাঞ্ছিত চিত্তহারী বংশীরব বাজিতেছে—যেমন বৃন্দাবনে রাধার কানে বাজিয়াছিল। তাহার পরে শত শত দংশনে বুদ্ধি শরীরের দিকে আকৃষ্ট হইল। সন্ন্যাসী নড়িলেন না—সবিস্ময়ে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “এ কি? আমার এমন ত কখন হয় নাই। যাক্, শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন, ক্ষুদ্র পিপীলিকাচয়রূপে

আমাকে দংশন করিতেছেন।” হরিমোহন দেখিল, দংশনের জ্বালা বুদ্ধিতে আর পৌঁছে না, প্রত্যেক দংশনে তিনি তীব্র শারীরিক আনন্দ অনুভব করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণপূর্ব্বক অধীর আনন্দে হাততালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পিপীলিকাগুলি মাটীতে পড়িয়া পলাইয়া গেল। হরিমোহন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “কেষ্টা, এ কি মায়া !” বালক হাততালি দিয়া দুইবার এক পায়ের উপর ঘুরিয়া উচ্চহাস্য করিল। “আমিই জগতের একমাত্র যাদুকর ! এ মায়া বুঝিতে পারিবে না, এই আমার পরম রহস্য। দেখিলে ? যন্ত্রণার মধ্যেও আমাকে ভাবিতে পারিলেন ত ! আবার দেখ।” সন্ন্যাসী প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বসিলেন ; শরীর ক্ষুৎ-পিপাসা ভোগ করিতে লাগিল, কিন্তু হরিমোহন দেখিল সন্ন্যাসীর বুদ্ধি সেই শারীরিক বিকার অনুভব করিতেছে মাত্র, কিন্তু তাহাতে বিকৃত বা লিপ্ত হইতেছে না। এই সময়ে পাহাড় হইতে

কে বংশীবিনিন্দিত স্বরে ডাকিল, "সখে!" হরিমোহন চমকিল। এ যে শ্যামসুন্দরেরই মধুর বংশীবিনিন্দিত স্বর। তাহার পরে দেখিল, শিলাচয়ের পশ্চাৎ হইতে একটি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক থালায় উত্তম আহার ও ফল লইয়া আসিতেছে। হরিমোহন হতবুদ্ধি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিল। বালক তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, অথচ যে বালক আসিতেছে, সেও অবিকল শ্রীকৃষ্ণ। অপর বালক আসিয়া সন্ন্যাসীকে আলো দেখাইয়া বলিল, "দেখ্, কি এনেছি।" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "এলি? এতদিন না খাওয়াইয়া রাখিলি যে? যাক্, এলি ত বোস্, আমার সঙ্গে খা।" সন্ন্যাসী ও বালক সেই থালার খাদ্য খাইতে বসিল, পরস্পরকে খাওয়াইতে লাগিল, কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। আহার শেষ হইলে বালক থালা লইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

হরিমোহন কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে-

ছিল, হঠাৎ দেখিল শ্রীকৃষ্ণ আর নাই, সন্ন্যাসীও নাই, ব্যাঘ্রও নাই, পর্ব্বতও নাই। সে একটি ভদ্র পল্লীতে বাস করিতেছে ; বিস্তর ধনদৌলত আছে, স্ত্রী-পরিবার আছে, রোজ ব্রাহ্মণকে দান করিতেছে, ভিক্ষুককে দান করিতেছে, ত্রিসন্ধ্যা করিতেছে, শাস্ত্রোক্ত আচার সযত্নে রক্ষা করিয়া রঘুনন্দন প্রদর্শিত পথে চলিতেছে, আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পুত্র হইয়া জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে ভীত হইয়া দেখিল যে যাহারা সে ভদ্রপল্লীতে বাস করে তাহাদের মধ্যে লেশমাত্র সদ্ভাব বা আনন্দ নাই, যন্ত্রবৎ বাহিরের আচার রক্ষাকেই পুণ্যবৎ জ্ঞান করিতেছে। প্রথমটা হরিমোহনের যেমন আনন্দ হইয়াছিল, এখন তেমনি যন্ত্রণা হইতে লাগিল। তাহার বোধ হইল যেন তাহার বিষম তৃষ্ণা লাগিয়াছে, কিন্তু জল পাইতেছে না, ধূলি খাইতেছে, কেবলই ধূলি কেবলই ধূলি অনন্ত ধূলি খাইতেছে। সেই স্থান হইতে পলায়ন

করিয়া সে আর এক পল্লীতে গেল, সেইখানে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে অপূর্ব্ব জনতা ও আশীর্ব্বাদের রোল উঠিতেছিল। হরিমোহন অগ্রসর হইয়া দেখিল, তিনকড়ি শীল দালানে বসিয়া সেই জনতার মধ্যে অশেষ ধন বিতরণ করিতেছেন, কেহই নিরাশ হইয়া ফিরিতেছে না। হরিমোহন উচ্চহাস্য করিল, সে ভাবিল, "একি স্বপ্ন! তিনকড়ি শীল আবার দাতা?" তাহার পরে সে তিনকড়ির মন দেখিল। বুঝিল, সেই মনে লোভ, ঈর্ষা, কাম, স্বার্থ ইত্যাদি সহস্র অতৃপ্তি ও কুপ্রবৃত্তি দেহি দেহি রব করিতেছে। তিনকড়ি পুণ্যের খাতিরে, যশের খাতিরে, গর্ব্বের বশে সেই ভাবগুলি ছাপাইয়া রাখিয়াছেন, অতৃপ্ত রাখিয়াছেন, চিত্ত হইতে তাড়াইয়া দেন নাই। এই সময় আবার কে হরিমোহনকে ধরিয়া তাড়াতাড়ি পরলোক ভ্রমণ করাইয়া আনিল। হরিমোহন হিন্দুর নরক, খৃষ্টানের নরক, মুসলমানের নরক, গ্রীকদের

নরক, হিন্দুর স্বর্গ, খৃষ্টানের স্বর্গ, মুসলমানের স্বর্গ, গ্রীকদের স্বর্গ, আর কত নরক, কত স্বর্গ দেখিয়া আসিল। তাহার পরে দেখিল, সে নিজ বাড়ীতে পরিচিত ছেঁড়া মাদুরে ময়লা তোসকে ভর দিয়া বসিয়া আছে সম্মুখে শ্যামসুন্দর। বালক বলিল, "বড় রাত্রি হইয়াছে, বাড়ীতে না ফিরিলে সকলে আমাকে বকিবে, মারামারি আরম্ভ করিবে। সংক্ষেপে বলি। যে স্বর্গ নরক দেখিলে, সে স্বপ্ন জগতের, কল্পনাসৃষ্ট। মানুষ মরিলে স্বর্গ নরকে যায়, গত জন্মের ভাব অন্যত্র ভোগ করে। তুমি পূর্ব্বজন্মে পুণ্যবান ছিলে, কিন্তু প্রেম তোমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, না তুমি ঈশ্বরকে ভালবাসিয়াছ, না মানুষকে। প্রাণত্যাগের পরে স্বপ্নজগতে সেই ভদ্রপল্লীতে বাস করিয়া পূর্ব্ব জীবনের ভাব ভোগ করিতে লাগিলে, ভোগ করিতে করিতে সে ভাব আর ভাল লাগে না, প্রাণ আকুল হইতে লাগিল, সেখান হইতে গিয়া

ধূলিময় নরকে বাস করিলে, শেষে জীবনের পুণ্যফল ভোগ করিয়া আবার তোমার জন্ম হইল। সেই জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৈমিত্তিক দান ভিন্ন, নীরস বাহ্যিক ব্যবহার ভিন্ন কাহারও অভাব দূর করিবার জন্য কিছু কর নাই বলিয়া এই জন্মে তোমার এত অভাব। আর এখনও যে নীরস পুণ্য করিতেছ, তাহার কারণ এই যে কেবল স্বপ্ন জগতের ভোগে পাপ পুণ্য সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় না, পৃথিবীতে কর্ম্মফল ভোগে ক্ষয় হয়। তিনকড়ি গত জন্মে দাতাকর্ণ ছিলেন, সহস্র ব্যক্তির আশীর্ব্বাদে এই জন্মে লক্ষপতি ও অভাবশূন্য হইয়াছেন, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হয় নাই বলিয়া অতৃপ্ত কুপ্রবৃত্তি এখন পাপ দ্বারা তৃপ্ত করিতে হইয়াছে। কর্ম্মবাদ বুঝিলে কি? পুরস্কার বা শাস্তি নহে—কিন্তু অমঙ্গলের দ্বারা অমঙ্গল সৃষ্টি, এবং মঙ্গল দ্বারা মঙ্গল সৃষ্টি। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। পাপ অশুভ, তাহা দ্বারা দুঃখ সৃষ্ট হয়; পুণ্য শুভ, তাহার দ্বারা সুখ সৃষ্ট হয়।

এই ব্যবস্থা চিত্তশুদ্ধির জন্য, অশুভ বিনাশের জন্য। দেখ হরিমোহন, পৃথিবী আমার বৈচিত্র্যময় জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ, কিন্তু সেখানে কর্ম্ম দ্বারা অশুভ বিনাশ করিবার জন্য তোমরা জন্মগ্রহণ কর। যখন পাপ পুণ্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া প্রেমরাজ্যে পদার্পণ কর, তখন এই কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাও। পরজন্মে তুমিও অব্যাহতি পাইবে। আমি আমার প্রিয় ভগিনী শক্তি ও তাহার সহচরী বিদ্যাকে তোমার কাছে পাঠাইব, কিন্তু দেখ, এক সর্ত্ত আছে, তুমি আমার খেলার সাথী হইবে, মুক্তি চাহিতে পারিবে না। রাজি?" হরিমোহন বলিল, "কেষ্টা, তুই আমাকে গুণ করিলি! তোকে কোলে লইয়া আদর করিতে বড় ইচ্ছা করে, যেন এই জীবনে আর কোন বাসনা নাই।"

বালক হাসিয়া বলিল, "হরিমোহন, কিছু বুঝিলে?" হরিমোহন বলিল, "বুঝিলাম বই

কি।” তাহার পরে একটু ভাবিয়া বলিল, “ওরে কেষ্টা আবার ফাঁকি দিলি। অশুভ সৃজন করিলি কেন, তাহার ত কোন কৈফিয়ৎ দিস্‌নি।” এই বলিয়া সে বালকের হাত ধরিল। বালক হাত কাড়িয়া লইয়া হরিমোহনকে শাসাইয়া বলিল, “দূর হ! এক ঘণ্টার মধ্যে আমার সব গুপ্তকথা বাহির করিয়া লইবি?” বালক হঠাৎ প্রদীপ নিবাইয়া সরিয়া সহাস্যে বলিল, “কই, হরিমোহন, চাবুক মারিতে একেবারে ভুলিয়া গেলে যে। সেই ভয়ে তোমার কোলে বসিলাম না, কখন বাহ্যিক দুঃখে চটিয়া আমাকে উত্তম শিক্ষা দিবে! তোমার উপর আমার লেশমাত্র বিশ্বাস নাই।” হরিমোহন অন্ধকারে হাত বাড়াইল, কিন্তু বালক আরও সরিয়া বলিল, “না, সে সুখ তোমার পরজন্মের জন্য রাখিলাম। আসি।” এই বলিয়া অন্ধকার রজনীতে বালক কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। হরিমোহন নূপুরধ্বনি শুনিতে শুনিতে জাগিয়া

উঠিল। জাগিয়া ভাবিল, "এ কি রকম স্বপ্ন দেখিলাম! নরক দেখিলাম, স্বর্গ দেখিলাম, তাহার মধ্যে ভগবানকে তুই বলিলাম, ছোট ছেলে বুঝিয়া কত ধমক দিলাম। কি পাপ! যা হোক, প্রাণে বেশ শান্তি অনুভব করিতেছি।" হরিমোহন তখন কৃষ্ণবর্ণ বালকের মোহন মূর্ত্তি ভাবিতে বসিল এবং মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল, "কি সুন্দর! কি সুন্দর!"
